রবীন্দ্র নাথের জীবনে মৃত্যুশোক

নিজের ৮০ বছর ৩ মাসের জীবনে বেশ কিছু অকাল মৃত্যুর সাক্ষী হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। মৃত্যু তাঁকে আহত করেছে, কিন্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এক দার্শনিক উপলব্ধির। তিনি নিজে এ বিষয়ে লিখে গেছেন -' যাহাকে ধরিয়াছিলাম,তাহাকে ছাড়িতেই হইলো,এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের মা - সারদাদেবী

রবীন্দ্রনাথের গর্ভধারিনী সারদাদেবী ছিলেন সত্যিই একজন রত্নগর্ভা মহিলা। কিন্তু ভারতরত্ন রবীন্দ্রনাথ যখন মাত্র ৭ বছর বয়সী একটি বালক, তখনই মৃত্যু সারদাদেবীকে গ্রাস করে নেয়।

সারদাদেবীর জীবন ছিলো ভীষণভাবে স্বামীকেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন ধার্মিক, শিক্ষানুরাগিনী ও নরম মনের একজন মানবী। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতের আদর্শ স্থানীয়া সতী নারীর জীবন্ত প্রতিরূপ। তাঁর মন-মানসিকতা,স্বভাব-প্রকৃতি, বাহ্যিক রূপ - এক কথায় তাঁর সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাই ছিলো বড় মধুর,বড় স্নিগ্ধ আর ঘরোয়া। তাঁর থেকে তাঁর এই স্নিগ্ধতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস মৃত্যুরও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন - 'বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম,তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিলোনা। সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম, তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।'

গভীর রাতে ঘুমন্ত শিশু রবীন্দ্রনাথকে জাগিয়ে তুলে সারদাদেবীর মৃত্যু সংবাদ শোনাবার চেষ্টা করে ছিলো তাঁদের বাড়ীর এক পুরাতন দাসী। কিন্তু, এতে শিশুর কোমল মনে আকস্মিক আঘাত লাগতে পারে ভেবে তাকে সরিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানী। অল্পক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেও সেই মুহূর্তে অন্ততঃ মায়ের মৃত্যু সংবাদ শোনা হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তবে একটা কিছু বড় ক্ষতি যে হয়ে গেছে,তা বুঝতে পেরেছিলেন।

পরের দিন সকালে মাতৃহীন হওয়ার খবরটি জানলেও মৃত্যুকে তাঁর কর্কশ মনে হয়নি। কিন্তু, শ্মশানযাত্রার সময় তিনি প্রথম অনুভব করলেন যে তাঁর মা আর কোনওদিন ফিরে আসবেননা। শোকের ঝড় বয়ে গেলো বুকের মধ্যে। মনটা হাহাকার করে উঠলো। সেই শোক আরও গভীর হলো দাহকার্য সেরে ফিরে যখন দেখলেন তাঁর পিতৃদেব স্তব্ধ হয়ে বসে তখনো উপাসনা করে চলেছেন।

নিতান্ত শৈশবে মাতৃহীন হলেও মায়ের ঐ স্নিগ্ধ রূপটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিলো। দেশকাল নির্বিশেষে এই রূপটিই যে নারীর শাশ্বত ও যথার্থ রূপ, তা ও মর্মে মর্মে অনুভব করে ছিলেন তিনি।

কাদম্বরী দেবী

রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবী যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বধুবেশে পদার্পণ করেন,তখন তাঁর বয়স নয় বছর আর রবীন্দ্রনাথের সাত বছর।

প্রায় সমবয়সী হওয়ায় খুব সহজেই উভয় উভয়ের খেলার সাথী হয়ে হঠেন। আর তারপরে হয়ে ওঠেন গল্পের সঙ্গী, সাহিত্যের দোসর।

শৈশব, কৈশরের পথ পেরিয়ে যৌবনের প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন দুজনে একই সঙ্গে। - পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁদের তুমুল সংস্কৃতিচর্চাও।

বিহারীলালের কাব্য পড়েন কাদম্বরীদেবী আর শোনেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিদাদার লেখা নাটক মানময়ীতে উর্বশী সাজেন কাদম্বরীদেবী,আর মদনের ভূমিকায় দেখা দেন তাঁর দেবর রবীন্দ্রনাথ।

মানুষকে উদ্বুধ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো কাদম্বরীদেবীর। তাই প্রতিভাময়ী, গুণবতী কাদম্বরীদেবী অচীরেই হয়ে উঠেছিলেন মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথের মর্মসহচরী। রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রথম পাঠক কাদম্বরীদেবী। তাঁর সমালোচকও তিনিই। তাঁর সোনার তরীর প্রথম কান্ডারী তিনি। ৭ থেকে ২৩ রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ১৪টা বছরকে মধুময় ও সাহিত্য সুগন্ধে সুরোভিত করে রেখেছিলেন কাদম্বরীদেবী।

কাদম্বরীদেবীর ছিলো সহজাত সৌন্দর্যবোধ। সেই সৌন্দর্যবোধের পরিচয় তিনি রেখেছেন গৃহসজ্জায়,তাঁর সাধের নন্দনকানন নির্মানে এবং রন্ধনশিল্পেও।

সাহিত্যপ্রেমী হওয়ার পাশাপাশি তাঁকে আমরা দেখেছি সুঅভিনেত্রী এবং সুগায়িকা হিসাবেও। ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে তাঁর ছিলো একটি বিশেষ স্থান।

তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্তা এক নারী। তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধতা বশতঃ তাঁর স্বামী সংস্কারের বেড়া অতিক্রম করে তাঁকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে,ঘোড়ায় চড়িয়ে সঙ্গে করে গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

তাঁর শ্বশুরবাড়ীর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন তাঁর প্রতি অনুরক্ত ও তাঁর সমর্থক।

কিন্তু এতো প্রাপ্তী, এতো সুখ,এতো সম্মানের ঠিক কেন্দ্রস্থল থেকে হঠাৎই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাঁকে,যে মৃত্যুকে আহ্বান করে এনেছিলেন তিনি নিজেই - কোনও

এক অজ্ঞাত কারনে অভিমান বশতঃ।
তাঁর মৃত্যু বিশ্বকবির জীবনে এক বিচিত্র শূন্যতার সৃষ্টি করেছিলো। বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিলো তাঁর চিন্তাভাবনার জগৎকে। সেই শূন্যতা,সেই আলোড়ন থেকে বিশ্বকবি সম্ভবতঃ কোনওদিনই মুক্ত হতে পারেননি।

মৃণালিণী দেবী

রবীন্দ্র নাথের বয়স তখন ২২ বছর ৭ মাস,তাঁর বিয়ে হলো ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী ফুলতলির বেণীমাধব রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ১০ বছরের বালিকা ভবতারিণীদেবীর সঙ্গে। ঠাকুর বাড়ীতে আসার পর তাঁর নাম বদলে রাখা হলো মৃণালিণীদেবী। নাম বদলের পর ধীরে ধীরে বদলে গেলো তাঁর ব্যক্তিত্বও। ঠাকুরবাড়ীর আদব কায়দা,বাচনভঙ্গীর ঘরোয়া তালিম শেষে তিনি ভর্তি হলেন লরেটোয়। শিখলেন ইংরাজি। আর বাড়িতে সংস্কৃত শিখলেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে। পাশাপাশি শিখতে লাগলেন পিয়ানোও। হয়ে উঠলেন ঠাকুর বাড়ীর উপযুক্ত বধু।
তাঁর স্বামীর 'রাজা ও রাণী' নাটকের প্রথম অভিনয়ে মৃণালিণী দেখা দিলেন 'নারায়ণী'-র ভূমিকায়।
তাঁর শ্বশুরবাড়ীর অন্যান্য মেয়ে ও বউমাদের মতো তিনিও অভিনয়, গান, সাহিত্যচর্চা, অনুবাদকর্ম ইত্যাদিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখালেন। সুনাম কুড়োলেন রন্ধনশিল্পী হিসাবেও। আবার, আত্মীয়দের সকলেরই সুখে সুখী,দুঃখে দুঃখী হয়ে,হয়ে উঠলেন তাঁদের পরম আত্মীয়,আত্মার আত্মীয়।
মৃণালিণীদেবীর বহিরাবরণে,ব্যক্তিত্বে,স্বভাবে কোথাও উগ্রতার ছায়ামাত্র ছিলোনা। ছিলোনা সোচ্চারে ছড়িয়ে পড়ার, ছাপিয়ে ওঠার বিন্দুমাত্র বাসনা বা প্রচেষ্টা।
তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিলো তাঁর বিশ্ববরেণ্য স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী এবং সহমর্মিনী হয়ে ওঠার মাধ্যমে।
সহজ,সরল, আন্তরিক,পরিহাসপ্রিয়, সুগৃহিনী, বিবাহিত জীবনে ভীষণভাবে সুখী এই নারী শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের সময় কবিগুরুকে সর্বোত ভাবে সাহায্য করেছিলেন।স্নেহে,সেবাপরায়ণতায় তিনি আশ্রমিকদের সকলেরই জননী হয়ে উঠেছিলেন। তাই মাত্র ২৯ বছর বয়সে তাঁর কোনও এক অজ্ঞাত অসুখে ভুগে মৃত্যুর পর মাতৃহারা হয়ে পড়ে গোটা আশ্রম। কবিগুরু নিজেই বলেন 'আমি তাদের সব দিতে পারি,মাতৃস্নেহ তো দিতে পারিনা।'
তাঁর মৃত্যু তাঁর স্বামীকে বড় অসহায় করে তুলেছিলো। সর্বক্ষণ তিনি অনুভব করতেন এই বিশ্বজননীর, তাঁর প্রিয়তমা 'ভাই ছুটি'-র অভাব। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন 'এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়।'
মাত্র ৪১ বছর বয়সে বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কবিগুরু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি। এতটাই অবিচল ছিলো তাঁর পত্নীপ্রেম।

রেণুকা দেবী

রেণুকাদেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিণীদেবীর মেজো মেয়ে কিন্তু তৃতীয় সন্তান। তাঁর ডাক নাম ছিলো রাণী।
মৃণালিণীদেবীর কোল আলো করে তিনি এসেছিলেন ১৮৯১ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে।
আর এর ঠিক ১০ বছর পরে ১৯০১ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
নতুন বিয়ের আনন্দ রেশ কাটার আগেই ধরা পড়লো যে তাঁর দেহে ক্ষয়রোগ বাঁধা বেঁধেছে।
চঞ্চল,অবুঝ,জেদী শৈশব অনুতীর্ণ মেয়েটি আশ্রয় নিলেন বিছানায়। শীর্ণ দুটি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে লাগলেন তাঁর একান্ত অসহায় বাবাকে। তাঁর কাছে গল্প শোনার আব্দার জানাতে লাগলেন।
বিশ্বকবি তাঁর এই মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের আব্দার মেনে তাঁকে শোনাতেন ছোট্টছেলের গল্প - 'শিশু'কাব্যগ্রন্থের কবিতা।
তারপর একদিন শেষ হয়ে গেলো গল্প শোনানোর পালা।
১৯০৩ সালে মাত্র ১২ বছর ৭ মাস বয়সে নিভে গেলো দুষ্টু,মিষ্টি মেয়েটির জীবনদীপ।
বাবা শেষ সময়ে তাঁকে উপনিষদের মন্ত্র বলে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। তাই বুঝি যাওয়ার আগে বাবার হাত ধরে তিনি বলেছিলেন 'বাবা,ওঁ পিতা নোহসি বলো।'
স্ত্রীকে হারানোর পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হলো সন্তান হারানোর অসহ্য শোক।

শমীন্দ্রনাথ

১৯ বছরের বিবাহিত জীবনে রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিণীদেবীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন ৫টি সন্তান। সর্বকনিষ্ঠটির নাম শমী - শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিলো ১৮৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে।
মৃণালিণীদেবী যখন মারা যান,শমীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫ বছর ১১ মাস।
কেটে যেতে থাকে দিন। মৃণালিণীদেবীর মৃত্যুর পর রেণুকাদেবীকেও শেষযাত্রায় পাঠাতে হয় বিশ্বকবিকে। আর তারপর, নিজের বাকি ৪ সন্তানকে একেবারে আঁকড়ে ধরে

বাঁচার এবং বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। কিন্তু, বাধ সাধে বিধি। ১০ বছর ১১ মাস বয়সে শমীন্দ্রনাথ বিহারের মুঙ্গের জেলায় গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হন ও মারা যান। তারিখটা ছিলো ১৯০৭ সালের ২৩শে নভেম্বর। প্রশঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে,ঠিক ৫ বছর আগে ১৯০২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে মৃত্যু হয়েছিলো কবিপত্নী মৃণালিণীদেবীর।

মাধুরীলতা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তানের নাম মাধুরীলতা। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮৮৬ সালের ২৫ অকটোবর তারিখে।

তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বাবা হওয়ার স্বাদ চাখিয়েছিলেন। তাঁকে কোলে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেছিলেন পিতৃত্বের অনুভূতি।

ভীষণ ভালোবাসতেন তিনি মাধুরীলতাকে।

মাধুরীলতার ডাক নাম ছিলো বেলা। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকতেন কখনো বেলি বলে, কখনো বেলুবুড়ী নামে।

মাধুরীলতা ছিলেন খুব ফর্সা,অপরূপ রূপবতী, সুশিক্ষিতা, সুগৃহিণী, সমাজসেবিকা এবং অতি অবশ্যই একজন সুলেখিকা।

১৯০১ সালে ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র আইনব্যবসায়ী শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে।

স্বামীর কর্মসূত্রে মাধুরীলতাকে মজঃফ রপুরের বাসিন্দা হতে হয়েছিলো। সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

মাধুরীলতা নিঃসন্তান হলেও বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর ছোটবোন মীরাদেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও শরতের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিশ্রী রকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেই জটিলতার আবর্তে পড়ে যান মাধুরীলতাও। অবশেষে ক্ষয়রোগজনিত মৃত্যু এসে তাঁকে মুক্তি দেয়। বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর।

মৃত্যু মিছিল রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশী করে সৃষ্টিশীলতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলো। মাকে হারানোর বেদনা রূপান্তরিত হয়েছিলো 'শিশু ভোলানাথ'এ। নতুন বৌঠান ও তাঁর আদরের ভাইছুটির মৃত্যু তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে করে তুলেছিলো প্রেমের পথের পথিক। রানী,শমী,বেলার মৃত্যু তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিলো পরিণত মনস্কতা, দার্শনিক বোধ।

মৃত্যু তাঁকে এতোটাই সৃষ্টিশীল করে তুলেছিলো যে তিনি নিজের মৃত্যুর ঠিক ৮ দিন আগে রচনা করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ কবিতাটি। - এর থেকেই বোঝা যায় যে তিনি জীবনের প্রতি কতটা মোহমুক্ত,মৃত্যুর প্রতি কতটা নিস্পৃহ এবং সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে কতটা মরিয়া ছিলেন।

মিঠু ঘোষাল
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ। কলকাতা-৭০০১৩৭।
ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৯২৪৩৪১, ০৩৩২৪৭০-৩৬৩৭। মোবাইল নম্বর-
৯২৩১৮১১৫৩৬, ৮৯৬১৩২৬০০৮।